নরকে এক ঋতু

র‍্যাঁবো



লোকনাথ ভট্টাচার্য

নরকে এক ঋতু



নরকে এক ঋতু

UNE SAISON EN ENFER

(A SEASON IN HELL)

র‍্যাঁবো

মূল ফরাসী থেকে

অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ

পৌষ ১৩৬১, ডিসেম্বর ১৯৫৪

দাম : দু-টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩



জাঁ আতুর্র র‍্যাঁবো

On pourrait s' e'tonner de cette introduction française á un livre bengali. Personnellement, j'en vois deux raisons—la première est que l' auteur, dont l' œuvre est traduite ici, était français, la seconde, la plus importante á mon avis, est que je n'ai pu pre'parer cette traduction aussi rapidement que grâce á l' enthousiasme et á l' inspiration que me communiquèrent les fêtes du Centenaire—Rimbaud cette année, á Charleville, la ville natale du poète. Je ne sais comment exprimer ma reconnaissance au Comite' du Centenaire—Rimbaud.

A l' occasion de ce centenaire, nous publions cette traduction bengalie de "Une Saison en Enfer" afin de présenter cette œuvre aux lecteurs du Bengale. Le Bengale ce'le'brera ainsi ce centenaire. Les Français en effet ne sont pas seuls á se réjouir de ce centenaire mais nombreux sont les e'crivains de mon pays qui sont fiers et heureux de céle'brer la me'moire de Rimbaud. Un écrivain français me fe'licitait l' autre jour d' avoir choisi Rimbaud parmi les poètes français sans m' attarder á Lamartine ou á Musset. Un ami ardennais au contraire m' accusait de te'mérité. Te'me'raire, oui, je l'avoue, cet effort d' un e'tranger qui, d' emblée, tente de traduire un des poètes français les plus difficiles.

Il va de soi qui je n'ai aucune pre'tention de présenter Rimbaud aux lecteurs français. Mais au Bengale, c' est la première fois que l' on publie la traduction d' une œuvre entière de Rimbaud. Cependant nombreux sont les Bengalis qui connaissent et aiment Rimbaud. Parmi nos poètes contemporains, plusieurs l' aiment même profondément, ne l' ayant pourtant découvert qu' á travers des traductions anglaises. Certains poèmes de Rimbaud ont été plus d' une fois traduits en bengali. Au Bengale et dans le reste de l' Inde, le nombre de ceux qui e'tudient le français s'accroît de jour en jour. Ma traduction, si insignifiante

qu' elle soit, resserrera encore, je l' espère, ces liens d' amitié qui, déjà, unissent nos deux pays.

Peut-être puis-je mentionner ici que beaucoup, en France, connaissent encore trop peu le Bengale. Que de questions ahurissantes n' ai-je entendues au sujet de l' Inde et du Bengale ? Une connaissance plus approfondie de l' art et de la littérature de chez nous apporterait, je pense, un nouvel enrichissement á votre littérature.

Je termine en saluant respectueusement Rimbaud, ce génie remarquable, ce très grand poète de France.

Paris, le 17 novembre, 1954 **Lokenath Bhattacharya**

অনেকে অনুযোগ করেন, অযৌক্তিক সে-অনুযোগ, যে ইংরেজিতে যেমন শেকস্‌পীয়র, জার্মানে গ্যতে, ইতালীয়তে দান্তে ও বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, ফরাসী সাহিত্যে নাকি সে-রকম কেউ নেই। তার উত্তরে ফরাসীরা বলবেন, ভিন্ন ক'রে একটা-ছুটো নাম কী দরকার, তাঁদের সাহিত্য থেকে বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর নিয়েই ও-রকম নাম তাঁরা একটার-পর-একটা ক'রে যেতে পারেন। তবু তার মধ্যে থেকেও যদি কেউ আমায় বলে, একটা অক্ষর বেছে নাও এবং একটা নাম করো, আমি বাছবো র এবং বলবো র‍্যাবো। র‍্যাবো আমার প্রিয়তম কবি এবং র‍্যাবোকে যাঁরা জানেন, তাঁদের ধারণা যে কোনো দেশের কোনো সাহিত্যে তাঁর তুলনা নেই।

কে এই র‍্যাবো? এক কথায় এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে বিদগ্ধ ফরাসীরাই বিপন্ন বোধ করবেন, আমি তো কোন ছার! তাঁকে কেউ বা বলবেন দানব, কেউ বা বলবেন দেবদূত, কেউ বা সকল গলা ছাপিয়ে নিজের গলাটিকে শুনিয়ে বলবেন— দানবও নন, দেবদূতও নন, মর-জগতের একজন মানুষ মাত্র।

র‍্যাবোকে অন্তত খানিকটা বুঝতে হ'লেও জানতে হবে ফরাসী সিম্বলিস্ট কাব্যকে, ভেরলেনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, তাঁর সমস্ত জীবন। বৃহত্তর পাঠক-সমাজে তিনি পরিচিত হ'তে আরম্ভ করেছেন সবেমাত্র। ভেরলেন তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড়ো, মালার্মে বারো বছরের এবং লাফর্গ ছোটো ছ' বছরের। তাঁরা সম্মান পেয়েছেন অনেক আগে। তবু র‍্যাবোকে নিয়ে আজ যতো কাজ হচ্ছে, তা সংখ্যার দিক থেকে লাফর্গ-সম্বন্ধীয় গবেষণার বহু শতগুণ বেশি, এবং ভেরলেন ও মালার্মে-সম্বন্ধীয় গবেষণার বহু বিংশতি গুণ বেশি। তাঁর জীবন সম্বন্ধে সমস্ত প্রহেলিকার সমাধান আজো হয় নি। আর কাব্য সম্বন্ধে যে-প্রহেলিকা— পনেরো থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে-ছেলে কবিতা লিখেছিলো, সে কী ক'রে এই-রকম কবিতা লিখতে পারলো সে-প্রহেলিকার সমাধান কখনো হবে না।

ফ্রান্সের এক প্রান্ত-সীমায় শার্লভিল ব'লে ছোট্টো একটি শহর। সেইখানে ১৮৫৪ সালের ২০ অক্টোবর জন্মালেন জাঁ আর্তুর র‍্যাবো। জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই এক মহান ছুঃখ তাঁকে ঘিরে ধরলো— তিনি জন্মালেন

চোখ খোলা নিয়ে। এই ছেলে 'voyant'— দার্শনিক— না হ'য়ে যায় কোথায়! এই চোখ নিয়েই একেবারে শৈশবেই উপলব্ধি করলেন, জীবনে নেই আসল জীবন, কিসের যেন অভাব সর্বত্র প্রতিফলিত। এই চোখ নিয়েই ষোলো বছর বয়সে বললেন, 'হয়তো দেখেছি তারে, লোকে যারে বলে দেখা যায়।'

বাড়ির তলায় বই-এর দোকান, সেখানে ব'সে-ব'সে পড়তেন রাজ্যের যতো বই। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা, তাঁকে হ'তেই হবে সবচেয়ে বড়ো দার্শনিক, দুরারোগ্যতম রোগী, চিরকালের অভিশপ্ত আত্মা, এবং, সবার ওপর, কবি। পড়াশুনোয় চিরকালই ভালো, কখনো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নি পরীক্ষায়। পনেরো বছর বয়সেই হ'য়ে উঠেছেন নাস্তিক, দার্শনিক, ছান্দসিক। ধর্মভীরু মা আঁতকে উঠলেন ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে।

ফ্রান্সে তখন আগুন লেগেছে, পারী-কম্যুনের যুগ। সারা পথ হেঁটে আসছেন র‍্যাঁবো সেই আন্দোলনে যোগ দিতে। লম্বা-লম্বা হাত, গোড়ালির-ওপরে-ওঠা ছোটো ময়লা প্যাণ্ট, উস্কোখুস্কো চুল, মুখে প্রকাণ্ড চুরুট আর সেই জলন্ত চোখ। এর আগেও পারীতে এসেছেন। একবার তো বিনা-টিকিটে রেল-ভ্রমণের জন্যে কারাবাসের দণ্ড পর্যন্ত ভোগ করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে কবিতা লেখা চলেছে। একদিন কী খেয়াল হ'লো, পাঠিয়ে দিলেন কিছু লেখা ভেরলেনকে, তখনো তাঁকে নামে চেনেন মাত্র। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর এলো ভেরলেনের: প্রিয় বন্ধু, মহাত্মা, আপনি এখানে চ'লে আসুন, পারী আপনার প্রতীক্ষা করছে। চিঠি পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে ষোলো বছরের কিশোর সেই রাত্রেই লিখে ফেললেন 'মাতাল তরণী'। পরের দিন সকালে পারী অভিমুখে যাত্রা। স্টেশনে নিতে এসেছেন ভেরলেন, খুঁজছেন কোনো হোমরা-চোমরা কাউকে— এই একরত্তি ছেলেটিই যে সেই মহাত্মা, তা তিনি কী ক'রে জানবেন? তাকে দেখেও দেখলেন না, ফিরে এলেন ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে। বাড়ি এসে দেখেন, র‍্যাঁবো ব'সে আছেন, পায়ের ওপর পা তুলে চুরুট টানছেন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে।

'—ওমেগা, তোমার দৃষ্টি কাঁপে নীল কিরণ-হিল্লোলে।'

সেই প্রথম দর্শনেই বিদ্ধ হলেন ভেরলেন, কী যে দেখলেন তাতে, তা তিনি নিজেই জানেন না। তাঁর নতুন বিবাহিত জীবন, কবিত্বের খ্যাতি, যা-কিছু অর্জন করেছেন জীবনভোর, সব-কিছুর কথা ভেবে সংকোচ ও ধিক্কার মিশ্রিত এক তিক্ততায় সমস্ত অন্তর তাঁর কুঁকড়ে উঠলো। পরের দিন সকালে র‍্যাঁবোকে নিয়ে গেছেন এক কাফেতে— র‍্যাঁবো নিচু গলায় প'ড়ে শোনাচ্ছেন তাঁর সবেমাত্র শেষ করা 'মাতাল তরণী'—

'নিঃসাড় নদীর জলে ভেসে যেতে তরণচঞ্চলে
কখন খেয়াল হ'লো গুণ-টানা মাঝিদের টান
থেমে গেছে— হতভাগ্য, প'ড়ে মত্ত বর্বর-দঙ্গলে
রক্তাক্ত খুঁটির গায় বিদ্ধ তারা, নগ্ন, লম্বমান।'

প্রথম চারটি পংক্তিতেই আবিষ্কার করলেন ভেরলেন, এই শিশু 'কলঙ্কিত, অপূর্ব ভীষণে'। তাঁর সমস্ত জীবন উল্টে-পাল্টে গেলো। র‍্যাঁবোকে ভ্রমণের লোভ দেখালেন, বললেন, 'চলো, একসঙ্গে থাকবো, একসঙ্গে বেড়াবো, আমার জীবন ধন্য হবে।' পিছনে প'ড়ে রইলেন নতুন বিবাহিতা স্ত্রী, যাঁর সঙ্গে আর কখনো মানিয়ে নিতে পারেন নি ভেরলেন।

কিন্তু এই নেশা কতোদিন থাকতে পারে? বিশেষ ক'রে র‍্যাঁবোর মতো পুরুষ-সিংহ, এক উত্তাল উদ্দাম বালক, সে কতোদিন সহ্য করবে এই 'প্রেম'? এইখানে পাঠকদের প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি 'নরকে এক ঋতু'র "নারকী প্রেমিক" পরিচ্ছেদটি। একদিন ব্রাসেলসে অশান্তি চরমে উঠলো— ভেরলেন রিভলভারের গুলিতে র‍্যাঁবোকে আহত করলেন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই কবিতা-লক্ষ্মীকে চিরবিদায় জানিয়ে আরম্ভ হ'লো র‍্যাঁবোর আমরণ ভ্রমণ। এ আবার অন্য র‍্যাঁবো। এ-জীবনও কিছু কম আশ্চর্যের নয়। সাঁইত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে আর কবিতা-রচনায় হাত দেন নি। 'ও-সব নিয়ে আর মাথা ঘামাই না,' পরে বলেছিলেন। সে-জীবন আমাদের আলোচ্য নয় এখানে। শুধু এইটুকু বলি, ওই যে কথায়-কথায় বলেছিলেন 'নরকে এক ঋতু'তে, চ'লে যাবেন অনেক দূরে মরু-প্রান্তরে, সমস্ত দেহ তৃষ্ণায় পুড়ে

ছাই হ'য়ে যাবে, ফিরবেন উত্তপ্ত লোহার মতো শরীর নিয়ে, সোনার সন্ধান নিয়ে, চোখ জ্বলবে রাত্রির অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদের চোখের মতো— এ-কথা তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁর দুঃসহ স্পর্ধা কখনো ব্যর্থ গর্বের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় নি।

বাংলাদেশে র‍্যাঁবো একেবারে অপরিচিত নন, তাঁর কোনো-কোনো লেখার অনুবাদ বাংলায় আগেই বেরিয়েছে। তবু এই প্রথম তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সম্পূর্ণ বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এক অর্থে বাংলাদেশেও তাঁর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হ'লো। জানি না ফ্রান্স ও অক্সফোর্ড ছাড়া পৃথিবীর আর কোন প্রদেশে তা অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হ'তে চলেছে। বাংলাদেশের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে আবার, এতে গর্ব বোধ করা উচিত সমস্ত ফরাসীরও।

Absoluteকে ছুঁতে চেয়েছিলেন, আঙুল দিয়ে বিঁধতে চেয়েছিলেন র‍্যাঁবো— তা তিনি ক'রে গেছেন অন্তত তাঁর কবিতায়। তাঁর লেখনীকে ব্যবহার করেছেন জাদুকরের সোনার কাঠির মতো। কিন্তু আন্তরিক সাধনা সত্ত্বেও সমগ্র জীবনকে রূপান্তরিত করতে তিনি পারেন নি— কারণ তার পথ আলাদা, এবং সেইজন্যেই হয়তো তাঁর প্রতি সহানুভূতি আমাদের আরো বেশি— শুধু ব্যর্থ আশা রেখে গেছেন :

'ভোরবেলা ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন হ'য়ে আমরা পৌছবো আশ্চর্য নগরীতে।'

পারী, ১৭ নভেম্বর, ১৯৫৪ লোকনাথ ভট্টাচার্য

যাঁর পরামর্শে র‍্যাঁবো পড়ার প্রেরণা পেয়েছিলাম

সেই বুদ্ধদেব বসু-কে

আমার এই অনুবাদ উৎসর্গ করলাম।

আগেকার দিনগুলোয়, ঠিক যদি স্মরণ হয়, জীবন আমার ছিলো উৎসব যেন, যেখানে নিখিল হৃদয় এসে মেলে, সমস্ত সুরার স্রোত অনুকূল হয়।

একদিন সন্ধ্যায় সুন্দরকে বসিয়েছি কোলে, দেখি সে তিক্ত হ'লো, দেখি তাকে আঘাত করেছি আমি।

ন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম মুখোমুখি।

পালালাম— হায় জাদুকরী, ভয়ংকরী, হায় দুঃখ, হায় রে ঘৃণা, যা-কিছু সম্পদ আমার লুকনো তোমার হাতে।

মন থেকে মানুষী আশার সমস্ত মুকুল নির্মূল ক'রে দিলাম। হিংস্র পশুর মতো চতুর উল্লম্ফনে গলা টিপে ধরলাম প্রতিটি আনন্দের।

ডাকলাম জল্লাদদের, মরবার আগে তাদের খাঁড়ার বাঁট কামড়ে ধরবো ব'লে— জড়ো করলাম জাঁতার কল, তারা যেন দ'লে পিষে গুঁড়িয়ে দিতে পারে আমায় বালুর সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে। দুঃখই হ'লো ভগবান। কাঁদার মধ্যে বিছিয়ে দিলাম নিজেকে— পাপের হাওয়ায়-হাওয়ায় শুকনো হলাম, পাগলামির পাকে-পাকে চক্কর খেলাম চমৎকার।

আর বসন্ত এনে দিলো আমায় নির্বোধের বীভৎস এক হাসি।

অবশেষে শেষ প্রবঞ্চনার ঠিক পূর্ণ মুহূর্তে মনে হ'লো, দেখি না কেন খুঁজে আমার হারিয়ে-যাওয়া উৎসবের চাবিটি, পেলেও পেতে পারি আমার স্পৃহা জীবনে!

সেই চাবিটি, দয়া তার নাম। —হঠাৎ এই প্রেরণা, এ শুধু স্বপ্ন জানি।

স্বপ্নই দেখলাম। 'হায়েনা তুই, হায়েনা থাকবি চিরকাল—' এমনি কতোকিছু চেঁচিয়ে উঠলো দানব, যার দেওয়া মোহনমালা পরেছি আফিম গাছের—'সঞ্চয় ক'রে চল মৃত্যু তোর স্পৃহায়-স্পৃহায়, তোর অহমিকায়, তোর পাপের যতো অমূল্য উপচারে।'

বাকি নেই ও-সব, বড়ো বেশি সঞ্চয় করেছি আমি এরই মধ্যে। কিন্তু হে শয়তান, বন্ধু আমার, কথা রাখো, অমন কুপিত কোরো না তোমার কটাক্ষ। ধৈর্য ধরো একটু— দুটো-একটা ছোটো-খাটো দুষ্ক্রিয়া এখনো

যা বাকি আছে আমার, তা-ও আমি শোধ ক'রে দেবো— কিন্তু তার আগে, যে-তুমি ভালোবাসো লেখকের মধ্যে বর্ণনাশক্তির, নীতিজ্ঞানের অভাব, সেই তোমাকে আজ আমি ছিঁড়ে দিই আমার অভিশপ্ত ইস্তাহারের বিকট কয়েকটি পাতা।

পূর্বপুরুষ ছিলেন গল্— চোখে আমার তাই নীল আর শাদা, মস্তিষ্ক ক্ষীণ, সংগ্রামে নৈপুণ্যহীনতা। পোশাকে পরিচ্ছদেও একই বর্বরতা। কেবল মাখন-মাখানো চকচকে চুলটি তাঁদের নেই আমার।

গল্‌রা পশুদের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলতেন, তখনকার তুচ্ছতম অর্বাচীন যতো গুল্ম আর তৃণদল জ্বালিয়ে দিতেন।

তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি পৌত্তলিকতা, মহানকে অসম্মান করার মতো প্রবৃত্তির মত্ততা— উঃ, যতো পাপ যেখানে আছে, ক্রোধ, বিলাসিতা —সেই আশ্চর্য বিলাসিতা এবং সবার ওপর মিথ্যাভাষণ ও আলস্য।

সকলরকম কাজের প্রতি আমার এক অদ্ভুত জবড়জং ভয়। শাসকই হোক, শ্রমিকই হোক, আর চাষাভুষোই হোক, সবাই সমান আমার কাছে— নীচ, হীনকুলোদ্ভব। যে-হাত লেখনী ছোঁয়, লাঙলও ধরবে সে-ই। এই হাত কী শতাব্দীই চিনেছে আজ! —আমার হাত তো চিনলো না তাকে, চিনবেও না কোনোদিন। গার্হস্থ্য কেবলি টেনে নিয়ে যাবে দূর হ'তে বহু দূরে, ভিক্ষুর সততাতেও ঘনিয়ে ওঠে বিলাপ। খোজা আর পাপী, দুয়েতেই সমান বিস্বাদ— আমি তাই অবিকল, গতিহীন, সবই সমতুল্য আমার কাছে।

তবু কে, কে আমার জিহ্বাকে এতো বড়ো নাস্তিক করেছে, যে এই কোলজোড়া আলস্যকে এতোদিন নির্বিঘ্নে রক্ষা ক'রে নিয়ে এলো, সে? দেহটার দিকে নজর তো দিই-ই নি, তবু কোনো ভেকও এতো তৃষিত নয় যেমন আমি। তাও তো বেঁচে গেলাম সবখানে। এমন পরিবার ইওরোপে নেই যাকে চিনি না— সব ঘরেই আছে আমার ঠাঁই, সবাই আমারই পরিবার। সকলেই গলা ফাটাচ্ছে মানুষের ন্যায্য অধিকার নিয়ে— সব পরিবারের খোকাদের দৌড় জানা আছে।

হায়, প্রিয় আমার প্রপিতামহরা ফ্রান্সের ইতিহাসের তুচ্ছতম ভূমিকাতেও যদি জড়িত থাকতেন! —নয়, নয় গো নয়।

সকল কৌলীন্যবর্জিত কুল আমার, স্পষ্ট সে-কথা। বিপ্লব কাকে

বলে, বুঝবো কী ক'রে? খুব যদি ওঠে আমার জাত, হয়তো সে লুণ্ঠন করবে একদিন। নিহত হ'তে পারলো না যে-সব নেকড়ে, তাদের দুর্ভাগ্য আমার মজ্জায়।

মনে পড়ে ফ্রান্সের ইতিহাস— ফ্রান্স, সে যেন গির্জার আদুরে বড়ো মেয়ে। নির্বোধ নিরক্ষরের মতো কতোবার হ'তে চেয়েছি তীর্থযাত্রী, কল্পনায় সমভূমি স্বয়াবের পথে-পথে করেছি পরিক্রমা, দেখেছি প্রাচীন কনস্ট্যানটিনোপল, সোলিমের দুর্গ-পরিখা— অখ্রীস্টান কতো না রূপকথায় বার-বার কেঁপে গেছে ক্রুশবিদ্ধের প্রতি আমার অনুকম্পা, পবিত্র মেরীর সম্প্রদায়ে জেগে উঠেছি থরথর চেতনায়।

ব'সে আছি কুষ্ঠরোগী, ভাঙা কলসি আর জলবিছুটির ওপর, সূর্যের আলোয়-আলোয় উচ্ছিষ্ট দেয়ালের পদপ্রান্তে। যদি পারতাম, বিস্মৃত এক অশ্বারোহী হ'য়ে শিবির ফেলতাম জার্মানীর তারকাখচিত রাত্রির তলায়।

আবার নাচবো ছুটির দিনে, পরবের দিনে, শিশু আর বুড়োদের নিয়ে রক্তাভ কাননপথে। বেশি দূরে গেলো না আমার স্মৃতি— চিনি এই পৃথিবীটুকু আর খ্রীস্টানী। অতীতের গহ্বরে নিজেকে ফিরে দেখার সৌভাগ্যে শেষ হবে না এ-জীবন। একাই থেকে গেলাম স্বজনবিহীন। কী ভাষা বললাম? নিজেকে পেলাম না খ্রীস্টোপদেশের শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে, না তাঁর কোনো ভক্ত চেলাচামুণ্ডার তালিকায়।

গত শতাব্দীতেই বা কী ছিলাম! মনে পড়ে না— না ছিলাম হাঘরে হ'য়ে, না ছিলাম কখনো অস্ফুট কোনো যুদ্ধে। আজই দেখছি নিজেকে। কৌলীন্যবর্জিত কুল সকলই মুছেছে— জনগণ (আজ যেমন বলছে সকলে), কার্যকারণ, জাতিত্ব কিংবা বিজ্ঞান।

হ্যাঁ, সেই বিজ্ঞান। মানুষ আবার ফিরে পেলো সব। শরীরের জন্যে, মনের জন্যে মানত করবার বদলে সে পেলো চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শন— সুন্দর মেয়েদের রোগের হ'লো প্রতিকার, লোক-সংগীত সাজানো হ'লো সুবিন্যস্ত। আর সেই সব যুবরাজসুলভ প্রমোদ ও তাঁদের সেই সব ক্রীড়া যাতে নগণ্যের ছিলো না অধিকার! মানুষ আবার ফিরে পেলো সব— ভূগোল, ভূ-বিবরণ, মন্ত্র-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র।...

বিজ্ঞান, নতুন আভিজাত্য সে। সে-ই তো প্রগতি। পৃথিবী চলেছে। কেনই বা চলবে না?

সংখ্যার এমনই দূরদৃষ্টি। চললাম আমরা ঋতের পথে। অতি নিশ্চিত, অতি সত্য এই দৈববাণী যা আমি বলছি। আমি তো বুঝি— তবু কী ভাবে বোঝালে তা পৌত্তলিকের বুলির মতো ঠেকবে না জানি না, তাই চুপ করলাম।

পৌত্তলিক সেই রক্ত আবার ফিরে পেলো— আত্মা হাতের কাছে: কেন খ্রীস্ট আমায় টেনে তুলবেন না, দেবেন না আমার মনকে সেই নম্রতা, স্বাধীনতা? ধর্মশাস্ত্রের যুগ চ'লে গেছে— হায় ধর্ম, হায় রে ধর্মশাস্ত্র!

ভগবানের জন্য ক্ষুধিত আমার প্রতীক্ষা, সকল অনন্তকাল ধ'রে নীচকুলোদ্ভব আমি।

দাঁড়িয়ে আছি আর্মরিকার* সমুদ্রতীরে, সন্ধ্যার আলোর মেখলায় সেজেছে নগরী। দিন শেষ হ'লো আমার, ইওরোপ ছেড়ে যাচ্ছি। সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় পুড়ে যাবে এই ফুসফুস, অবলুপ্ত আবহাওয়ার গন্ধে তামাটে হ'য়ে যাবো। সাঁতার কাটবো, গুঁড়ো ক'রে যাবো তৃণদল, শিকার করবো। ধূমপান তো আছেই— ফুটন্ত ধাতুর মতো তীব্র তিক্ত সুরা পান করবো, যেমন করতেন প্রিয় প্রপিতামহরা আগুনের ধারে ব'সে।

যখন আসবো ফিরে, আসবো লোহার মতো শরীর নিয়ে, কৃষ্ণ চর্ম নিয়ে, চোখ জ্বলবে উন্মত্তের মতো: মুখোশটি দেখেই লোকে বলবে উঁচু জাত। সোনার সন্ধান নিয়ে ফিরবো, ভয়ানক তৃষ্ণা পাবে আমার, হবো পাশবিক। গরম দেশের মেয়েরা এইরকম অসমর্থ অথচ ভীষণদেরই সেবা করতে ভালোবাসে। রাজনীতি করবো। বেঁচে যাবো।

আজ আমি অভিশপ্ত, স্বদেশকে ভয় করি বাঘের মতো। সবচেয়ে সুন্দর হ'লো যা, তা' হচ্ছে মাতাল ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়া বিস্তীর্ণ বালুকা-তটে।

যেতে-যেতেও চায় না যেতে মন। ধরি পথ নতুন ক'রে, যে-পথ

* আর্মরিকা: গল্-এর এক অংশের পুরোনো নাম, বর্তমানে ব্রিটানি।

আমার পাপের বোঝায় ভারাতুর— সেই পাপের পীড়নমুখর শিকড়গুলি বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে, উঠেই চলেছে আকাশের দিকে আমাকে ধাক্কা মেরে, উল্টে ফেলে, কখনো বা হিঁচড়ে-হিঁচড়ে টেনে।

অন্তিম অজ্ঞতা, অন্তিম সংকোচ— এই যেন শেষ হয়। আমার বিরাগ আর আমার বঞ্চনায় পৃথিবী যেন কলুষিত না হয়।

চলো— পা ফেলো— এসো বোঝা, মরু, আতঙ্ক, ক্রোধ।

কার হাতে সমর্পণ করবো নিজেকে ? কোথায় সেই পশু যাকে আদর করবো ? আক্রমণ করবো কার পবিত্র মুখচ্ছবি ? টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলবো কাদের হৃদয় ! কোন মিথ্যাকে নেবো কোলে তুলে ? —হেঁটেই বা চলবো কোন রক্তে ?

প্রথমেই ন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে হবে— কঠিন জীবন, সরল মূঢ়তা, তুলে ধরা, এগিয়ে দেওয়া, শিথিল মুষ্টিবন্ধ, শবাধারের আচ্ছাদন, ব'সে পড়া, দম বন্ধ হ'য়ে আসা। এমনি ক'রেই বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া— ভয়ের কিছু নেই, ভীতি ফরাসীর জন্যে নয়।

হায়, এতোই ভীষণ হ'লো হতাশা, নিবেদন করতে রাজী আছি আমার সকল উৎস যে-কোনো দেবতাকে যদি তা পূর্ণের পথ দেখিয়ে দেয়।

নিজেকে অস্বীকার, আশ্চর্য এই বদান্যতা— হাজার হ'লেও !

পরম ঋতের রাজ্য ! মাথা খারাপ হ'লো নাকি আমার !

যখন খুব ছোটো ছিলাম, ভালো লাগতো এক দুর্দম কয়েদীর কল্পনা— কারাগারের দ্বার যাকে মুক্তি দিলো না কোনোদিন। ঘুরে বেড়িয়েছি সেই সব নাম-না-জানা সরাই আর পান্থশালায়, তার ক্ষণ-অবস্থিতিতে একদিন যা ধন্য হয়েছে—তার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি আকাশের নীল, প্রান্তরে মুকুলিত শ্রমের বিস্তার, তার নিয়তির গন্ধ পেয়েছি শহরে-শহরে। তার যতো শক্তি ছিলো, তা কোনো তপস্বীরও নেই, তার মতো সুবুদ্ধি নেই কোনো ভ্রাম্যমাণের— সে, শুধু সে-ই একমাত্র তুলনা তার মহিমার, তার অবৈকল্যের।

শীতের রাত্রির পথ, তার ওপর দিয়ে গৃহহীন, বস্ত্রহীন, অন্নহীন কার স্বর আমার তুহিনশীতল হৃদয়কে আঁকড়ে ধ'রে চেঁচিয়ে ওঠে: 'অশক্তি না শক্তি? —শক্তি-ই সে তোমার বেলা। জানো না কোথায় চলেছো, কেনই বা চলেছো, প্রবেশ সবখানে, সাড়াও তোমার সর্বত্র। মারবে তোমায় কে? আর যদি-ই বা মারে, বড়ো জোর মৃতদেহ হবে বৈ তো নয়!' সকাল না হ'তেই এমন ক'রে হারালো সে দৃষ্টি, অবলুপ্ত হ'লো আকৃতি তার যে মনে হ'লো যা দেখেছি, আসলে হয়তো তা দেখি নি।

শহরের কাদা কখনো ঠেকেছে আমার চোখে লাল আর কালোয় মেশানো এক বিচিত্র বস্তু। যে-প্রদীপ পাশের ঘরে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়ায়, যেন তার ছবি আয়নায়— সে যেন অরণ্যের মণিমানিক। 'আশ্চর্য' ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছি। আমি যে দেখেছি সমুদ্র বহ্নিমান, ধোঁয়া ছুটেছে আকাশে, ডাইনে-বাঁয়ে রত্নভাণ্ডার জলজল করে কোটি বজ্রাগ্নিতে।

কিন্তু সুরাপান নিষিদ্ধ আমার— মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বও চলবে না। এমন কি সঙ্গীও হ'তে পারবে না কেউ। সামনে দেখি একপাল লোক মরিয়া হ'য়ে উঠেছে জল্লাদকে দেখে— কান্নায় ঝ'রে পড়ছে তাদের শত দুঃখের কাহিনী, না বুঝেই যা তারা ক্ষমা ক'রে এসেছে 'জান্ দার্ক'-এর মতো। 'পুরুতমশাই, গুরুমশাই, প্রভুমশাই, কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আমায় কী ভুলই করলে তোমরা! এ-দলের আমি নই, নই, নই গো নই— কোনোদিন খ্রীস্টান ছিলাম না আমি, থাকবোও না কোনোদিন— যে-কুলে জন্ম আমার, সে গান গেয়ে ওঠে যখনই দুঃখ পায়। আইন বুঝি না, নীতিজ্ঞানশূন্য, আমি এক পশু। ভুল করেছো তোমরা!'...

সত্যি, তোমাদের আলোয় আমার চোখ বন্ধ করেছি। আমি পশু, গোলামের জাত। তবু ত্রাণ পেতে পারতাম। আর তোমরা, মুখোশপরা গোলাম সব, যথেচ্ছাচারী, খামখেয়ালী, হিংস্র, কৃপণ? শুনছো বণিক, তুমি গোলাম; হাকিমসাহেব, তুমিও গোলাম; সেনাপতিমশাই, তুমিও তাই। আর তুমি সম্রাট, সনাতন এক কণ্ডূয়ন, তুমিও গোলাম— তুমি মদ কেনো আয়কর না দিয়ে, শয়তানের তৈরি সে-মদ। লোকগুলো প্রেরণা পেলো জর আর কর্কটরোগে। বৃদ্ধ ও অসমর্থদের তো খাতিরের সীমাই নেই— তারা ব'লে বসলো, আমরা ফুটন্ত জলে ফুটতে চাই।

সবচেয়ে বজ্জাত তো সে-ই যে পালায় নিজের দেশ ছেড়ে, তার মূঢ়তা শিকার খুঁজে ঘুরে মরে, পাকড়াও করে এই বেচারাদের তার নির্বুদ্ধিতার জামিন হিসেবে। এতোক্ষণে নিগ্রোদের প্রপিতামহ 'কামে'র রাজ্যে ঢুকে পড়েছি।

প্রকৃতিকে কি জানি আমি? জানি কি নিজেকে? উত্তর নেই। মৃতদের লুকিয়ে ফেলেছি আমার পাকস্থলীতে। চেঁচাও, কাঁদো, বাজনা বাজাও, নাচো, নাচো— নাচো। সময়ের দিকে খেয়াল নেই— শ্বেতবর্ণরা কখন যে নামলো তীরে জানি না। নবজাতকের চরণে চলেছি নিজেকে সমর্পণ করতে।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কান্না, নৃত্য, নৃত্য, নৃত্য— নৃত্য!

তীরে নামলো শ্বেতরা। নেমেই বন্দুক। কিন্তু দীক্ষা দিতে হবে ধর্মের, দিতে হবে পোশাক-পরিচ্ছদ, কাজ করতে হবে।

ঐশী করুণা ছুঁয়ে গেলো হৃদয় আমার। প্রস্তুত ছিলাম না তার জন্যে।

খারাপ তো কিছুই করি নি। দিনগুলো হালকা হ'য়ে এলো— অনুতাপ অন্তত রক্ষা করবে আমাকে। মৃতপ্রায় হৃদয়টা আর দুমড়ে মুষড়ে যাবে না ব্যথায়, আজ সেখানে উঠবে গম্ভীর দ্যুতি, শবযাত্রার মোমবাতির মতো। পরিবারের সেই খোকার নিয়তি চিনলো অকালমৃত্যু যা স্বচ্ছ অশ্রুর রসধৌত। অমিতাচার ঘৃণিত, সন্দেহ নেই, পাপও ঘৃণিত; গলা-পচা জিনিস ফেলে দেওয়াই ভালো। তবু ঘড়ি বাজবে সেই পূর্ণ দুঃখের ঘন্টায়, অন্য সময় নয়। কেউ কি তুলবে আমায় শিশুর মতো, খেলবার অধিকার দেবে সেই স্বর্গে যা সকল যন্ত্রণার মৃত্যুসমান?

একটু তাড়া করো। এখনো কি জীবন আছে?—ঐশ্বর্যে কে ঘুমোতে পারে? তা যে চিরকালের অনাবৃত স্থান। দেবতার প্রেম না পেলে বিজ্ঞানের চাবিকাঠির সন্ধান নেই। আজ দেখি প্রকৃতিতে কল্যাণেরই প্রদর্শনী। কল্পনা, আদর্শ আর প্রমাদ, বিদায় তোমাদের।

পারের কাণ্ডারী দেবদূতকে দিলেন অতীন্দ্রিয় গানের মূর্ছনা, এমনি দেবতার প্রেম। —প্রেম দু-দিকেই। আমি মরতে রাজী আছি পার্থিব

প্রেমের বেদনাতেও— ভক্তিতে সে-মৃত্যু। যাদের ছেড়ে যাচ্ছি, তাদের বেদনা ধ্বনিত হবে আমার যাত্রার পরে। জাহাজ-ডুবির হতভাগ্যদের মধ্যে আমায় বেছে নিয়ো তুমি। যারা প'ড়ে থাকবে, তাদের কি বন্ধু ভাবতে পারবো?

—বাঁচিয়ো তাদেরও।

এতোদিনে পেলাম সংগতি। শুভ এই পৃথিবী! আশীর্বাদ ক'রে যাবো জীবনকে। ভাই যারা, ভালোবাসবো তাদের। শিশুসুলভ শপথ করছি না, বার্ধক্য অথবা মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে বাঁচবার আশাও এ নয়। দেবতা দিলেন জয়, আমি গাই তাঁর জয়গান।

নেই আর আমার প্রেম সেই বিরক্তিকে নিয়ে। মত্ততা, অমিতাচার আর পাগলামির সব কথাই জানি— জানি তার উৎস, তার ধ্বংসোন্মুখ পরিণতির ইতিহাস। সমস্ত বোঝা ফেলে দিয়ে এলাম। উদ্‌ভ্রান্তের মতো নয়, পরিষ্কার খোলা চোখে দেখবো— আমার সারল্য গেলো কতোদূর।

বেত্রাহতের সান্ত্বনা নিয়ে কি হবে? এখনো ভাবতে রাজী নই যে যাত্রা করেছি কোনো বিবাহোৎসবে ধর্মপিতা যীশুখ্রীস্টকে সঙ্গে নিয়ে।

বুদ্ধির কারাগারে বন্দী তো নই। আমি শুধু ভগবানের নাম নিয়েছি, নমস্কারের মধ্যে দিয়ে চেয়েছি স্বাধীনতা। কী ক'রে তাকে অনুসরণ করবো? চপলতায় রুচি নেই আর। ভক্তিরও ধারি না ধার, ঐশী প্রেমেও সাধ নেই। ভাবপ্রবণ যে-শতাব্দী চ'লে গেছে, আক্ষেপ নেই তাকে নিয়ে। নিন্দাই বলো আর বদান্যতাই বলো, যে যার আপন আলোয় সকলেই ঠিক। আমার আসনটিকে শক্ত ক'রে বসিয়েছি সুস্থ বুদ্ধির সেই দ্যুতি-দীপ্ত আরোহণীর চরম শৃঙ্গে।

স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলে গৃহী হবো কি? —না, তা পারবো না। বড়ো ক্লান্ত আমি, বড়ো দুর্বল। কর্মের দ্বারাই জীবন পুষ্পিত হয়— বহু পুরোনো কথা। আমার জীবন এতো হালকা যে সে কেবলি ভেসে বেড়ায়, কাজকে সযত্নে এড়িয়ে পালায় দূর দূরান্তরে পৃথিবীর সেই স্বপ্নের কোণটি খুঁজে।

ধীরে-ধীরে যেন বেশি-বয়সের মেয়েদের মতো হ'য়ে যাচ্ছি— সাহস হারিয়ে ফেলছি মরণকে ভালোবাসার।

ঈশ্বর যদি দিতেন আমাকে স্বর্গীয় প্রশান্তি, প্রার্থনা করার মন, দ্যুলোকের চেতনা, যেমনটি দিয়েছিলেন পুরাকালের ঋষিদের। কতো শক্ত ছিলেন তাঁরা! বৈরাগী হ'য়েও শিল্পী। তেমনটি আর হয় না কেন!

নিরন্তর পরিহাস— সারল্যই কাঁদালো আমায়। এই পরিহাস সকলকেই বহন করতে হবে। জীবনই তাই।

যথেষ্ট হয়েছে, শাস্তির চূড়ান্ত হ'লো। এবার চলো।

উঃ, ফুসফুসটা জ্ব'লে গেলো! মন্ত্রিত মন্দিরের চূড়া! সূর্যের দাপটে রাত্রি চরকিবাজি খাচ্ছে চোখে আমার। হৃদয়টা···গা-হাত-পাগুলো···

কোথায় চলেছে সব? যুদ্ধে? আমি অশক্ত। অন্যেরা এগোয়। বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র······উঃ, কী সময়!

আগুন, আগুন! কোথায় যাই! থাক গে— মেরে ফেলি নিজেকে, ঘোড়ার খুরের তলায় ফেলে দিই!

আঃ!

—হ'তেই হবে অভ্যস্ত এ-সবে।

তা-ই তো ফরাসীর জীবন। গৌরবের পদচিহ্ন তাতেই।

অতি প্রসিদ্ধ গরলের এক ঢোঁক গিলে ফেলেছি। যে-নির্দেশ এলো আমার কাছে, তা ধন্য হোক, ধন্য হোক, ধন্য হোক। অন্ত্রের জ্বালায় জ্ব'লে গেলাম। প্রচণ্ড গরলে আমার গা-হাত-পা বেঁকে-চুরে শেষ হ'য়ে গেলো, বিকৃত হ'য়ে গেলাম, কে যেন আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, দম বন্ধ হ'য়ে এলো, চেঁচাতেও পারি না। এই-ই নরক, এ-যন্ত্রণার শেষ নেই! ছাখো ছাখো, আগুন কী ক'রে মাথা তুলছে! আমাকে জ্বলতেই হবে— জ্বল্ তবে রাক্ষস।

যেন আভাস পেয়েছিলাম, ভাবান্তর যা ঘটবে, তা শুভরই পথে, সুন্দরেরই পথে— সবই নেবে প্রণামের রূপ। সেই আভাসকে বর্ণনা করতে পারবো কি আজ— নরকের হাওয়া যতোই করুক, প্রার্থনাকে কলুষিত করতে পারবে না।

এতো যে অযুত লক্ষ লোক অপূর্ব চরিত্রের, কী পবিত্র মিষ্ট একতান, শক্তি, শান্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা— আমি তার কী জানলাম?

অনেক অনেক আকাঙ্ক্ষা!

আর তা-ই তো জীবন! এখনো কি বেঁচে আছি? অভিশাপ কি শাশ্বত? নিজেকে কেটে ফেলতে চায় যে, সে তো অভিশপ্ত নিশ্চয়ই— নয় কি? যদি মনে হয় নরকে রয়েছি, তবে নরকেই রয়েছি। এ-দণ্ড ধর্মেরই শিক্ষাদান। আমি গোলাম আমার ধর্মের, আমার দীক্ষার। মা-বাবা, আমার কষ্টের হেতু তোমরাই, নিজেরাও মরেছো, আমাকেও মেরেছো। নির্দোষ বেচারা! —পৌত্তলিকদের আক্রমণ করে না নরক। —আরে, সত্যিই তো বেঁচে আছি! অভিশপ্তের আনন্দ পরে আরো গভীর হবে। আর-একটা পাপ, তাড়াতাড়ি, ঝট্ ক'রে— তা হ'লেই শূন্যতায় প্রাণ-বিসর্জন করবো। মানুষের আইনে তো তাই বলে!

চুপ করো। লজ্জা নেই? লোকে কী বলবে ভয় নেই? শয়তান যে বলে, আগুন নীচ কুলোদ্ভব, আমার ক্রোধও নাকি ভীষণ এক নির্বোধের মতো! —যথেষ্ট! ……ভুলে-ভুলে হতাশ্বাস ঘনিয়ে উঠলো— ভোজ-বাজি, কপট সুরভির ইন্দ্রজাল, ছেলেমানুষি গান! বলবে না আমি

সত্যকে ধরেছি আঁকড়ে, দেখেছি চরম ন্যায়, বিচার আমার ঠিক, স্থির ? ···অহংকার ? —হয়তো। মুখের চামড়া শুকিয়ে উঠলো। এ কী করুণা ! প্রভু, ভয় করছে যে আমার, আমি যে তৃষ্ণার্ত, তৃষ্ণায় জ্ব'লে গেলো বুক। হায় সেই শৈশব, তৃণদল, বৃষ্টি, পাষাণের কোলে জাগা হ্রদ, আর চাঁদের সেই মায়া যখন ঘণ্টা বাজে মধুর···কোনো শয়তান ব'সে আছে সেই ঘণ্টায়। মেরী, পবিত্র কুমারী ! ···মূঢ়তাতেও ভয় আমার।

তলায় ওইখানে এমন একটা প্রাণও কি নেই যে সৎ, যে আমার ভালো চায় ? এসো তবে। কান দুটো এখনো আমার আছে মুখের পাশে। কেউ কি শুনতে পাও না আমার কথা ? শুনো না, সবই আমার আজগুবি কল্পনা। পাশের লোকটার কথা কেউ তো চিন্তা করবে না, কখনো না। এগিয়ে এলো না কেউ। পোড়া গন্ধের ঘ্রাণ পাচ্ছি— কিছু পুড়ছে নিশ্চয়ই।

ছায়াবাজির অন্ত নেই— ভালোই তো। সেই ইতিহাস যা আমার আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে, তাতে আস্থা হারানো আদর্শের বিস্মৃতি। যদি চুপ না করি, পদ্য লিখিয়ের দল আর স্বপ্নপাগলগুলো ঈর্ষা করতে আরম্ভ করবে। ওদের হাজার-হাজার গুণ ঐশ্বর্য আমার। সিন্ধুর মতো কৃপণ হওয়াই শ্রেয়।

ওই তো, জীবনের ঘণ্টাটা থেমে গেলো ঠিক সময়ে— আর এই পৃথিবীতে নেই আমি। ব্রহ্মবিদ্যা বড়ো ভয়ানক বিদ্যা— নরকটা নিঃসন্দেহে তলায়, আর আকাশটা ওপরে। উল্লাস, দুঃস্বপ্ন আর ঘুম বহ্নির নীড়ে।

বিদ্বেষে ছেয়ে গেলো এই আকাশ-বাতাসের মন। শয়তান, নাস্তিক ফার্দিনান্দ, পালাচ্ছে অরণ্যের বীজ নিয়ে······ যীশু চলেছেন রক্ত গুল্মাচ্ছাদিত পথে তাদের আনত না ক'রেই। যীশু চলেছেন তিক্ত বিরক্ত জলের উপর দিয়ে। লণ্ঠনের আলো আমাদের দেখালো সম্মুখের পথ, শাদা আর বাদামি কতো কেশগুচ্ছ— পান্নার গর্ভে যেমন খেলে ঢেউ।

সমস্ত রহস্যকে আমি নগ্ন ক'রে দেবো— প্রকৃতির রহস্য, ধর্মের রহস্য, জন্ম-মৃত্যু, অতীত-ভবিষ্যৎ, রহস্য বিশ্বসৃষ্টির অথবা শূন্যতার। আজগুবিতে আমার সঙ্গে পারবে কে ?

শোনো—

কোনো দক্ষতা আমার নেই? কেউ নেই এখানে, তবুও কেউ আছে। আমার ভাণ্ডার আমি খুলে দিতে রাজী নই। গোলাপী রঙের গান চাও কেউ, অথবা অপ্সরার নাচ? চাও কি কেউ, আমি অদৃশ্য হবো, ডুব দেবো কোনো হারানো আংটির সন্ধানে? চাও? সোনা তৈরি করবো, বার করবো ওষুধ।

অতএব গর্বিত হও আমাকে নিয়ে— জেনো, বিশ্বাসই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, আনে শান্তি, আরোগ্য। সবাই এসো, ছোট্টো শিশুরাও এসো —তোমাদের হ'য়ে এইটুকু সান্ত্বনা বহন করবো: যেন কেউ তার হৃদয় উন্মুক্ত করে তোমাদের প্রতি, তার আশ্চর্য হৃদয়! শ্রমিক বেচারারা, কী প্রার্থনা চাইবো— যদি সুখী হই কোনোদিন, হবো তা তোমাদের বিশ্বাসের জোরেই।

আমার কথাটা ভাবো। পৃথিবীকে নিয়ে অনুতাপ আমার কতো কম হবে তবে! ভাগ্য হবে অনুকূল, যন্ত্রণা পাবো না আর। জীবনটা আগে যা ছিলো, শুধুই মূর্খতার মাধুর্যে, অনুতাপ তারই জন্যে।

এসো, নাচো, মুখ ঘোরাও নানান রকম।

এতোক্ষণে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বাইরে আমরা। একটি শব্দও নেই আর। সকল নৈপুণ্য আমার পালিয়ে বেঁচেছে। আঃ, আমার দুর্গ, আমার সাধের স্যাক্সনি, আমার উইলো বন। সারা দিন, সারা রাত, সারা সকাল, সারা বিকেল……ক্লান্ত হলাম কি?

একদিন-না-একদিন নরক আমায় টানতোই আমার ক্রোধের জন্যে, আমার অহংকারের জন্যে— এবং সোহাগেরও এক নরক; কী বিচিত্র একতান নরকের!

অবসন্ন হ'য়েই মরেছি কেবল। তাতেই তো কবর— পালালাম কাব্যের দিকে, ভয়েরও ভয় যা। শয়তান, ভাঁড়, আমাকে চূর্ণ করতে চাও তোমার মোহিনী মন্ত্রে। আমি চাই, দাবি আমার, আমাকে দাও কাঁটা, একটি খোঁচা শুধু, দাও আগুনের একটি বিন্দু।

আবার জীবনে ফিরে যাওয়া! চোখ বুলোনো হাজার বিকৃতিতে! আর সেই গরল, সহস্রবার অভিশপ্ত সেই চুম্বন। আর সেই দুর্বলতা

আমার। নিষ্ঠুর পৃথিবী। দয়া করো ঈশ্বর, লুকিয়ে ফেলো আমায়! কী যে খারাপ লাগছে আমার! লুকিয়ে তো আছি, তবু যেন মনে হয় দেখছে সকলে।

আগুনটা তার হতভাগ্য সহচরকে নিয়ে জ্ব'লে ওঠে বার-বার।

পাগলিনী কুমারী
নারকী প্রেমিক

নরকের এক সঙ্গীর অকপট স্বগতোক্তি থেকে :

'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, তোমার সেবিকাদের মধ্যে দুঃখীতমা যে, তাকে অধিকার দাও আত্মনিবেদনের— আমার সকলি গেছে— আমি পানোন্মত্তা, হৃতসংবিৎ। আমি অপবিত্রা— কী ভয়ানক জীবন!

'ক্ষমা করো ঈশ্বর, ক্ষমা করো আমায়— ঝরুক নয়নের জল, আরো, আরো, আরো। এইমাত্র কামনা আমার!

'আমি এখন পৃথিবীর অতল-তলে— কোথায় বন্ধুরা! না না, বন্ধু তো নয়— এই প্রলাপ, এই যন্ত্রণার তুলনা নেই। ···সকলি মূঢ়তা নয় তো?

'আমার যে বড়ো কষ্ট, আমি যে কাঁদছি— সত্যিই, বড়ো কষ্ট আমার। দিয়েছো সবই আমায়— তবু অভাগার কপাল, তার হৃদয় শুধু নিন্দা ও গ্লানিতে জর্জর হ'লো!

'যা-ই হোক, এসো এক গোপন অঙ্গীকার করি— বিশ বার আওড়াবো এটাকে, প্রত্যেকবার তুচ্ছ মনে হবে, দুঃসহ মনে হবে— তবু।

'আমি যে ক্রীতদাস এক নারকী প্রেমিকের, বাতুল কুমারীর দল তাকে ত্যাগ করেছে। এই প্রেমিক দৈত্যটি নেহাৎ মন্দ নন। ভূত নন, প্রেত নন, ভ্রম নন। কিন্তু আমি যে হারিয়েছি শান্তি, আমি যে অভিশপ্ত, মৃত জগতবাসীর কাছে— আমাকে হত্যাও করবে না কেউ। কী ক'রে বলি তোমায়, মুখে কথা আসে না। বিপুল শোকে শুধু কাঁদি আর ভয় পাই। একটু টাটকা হাতের ছোঁওয়া দাও প্রভু দয়া ক'রে, এতো দয়াই যদি থাকে তোমার!

'আমি বিধবা, অনেকদিনই— প্রথম হ'তেই ছিলাম গম্ভীর, আপন কর্তব্যে ঠিক, কঙ্কাল হ'তে হবে একদিন ভেবে জন্ম নিই নি! আর সে ছিলো প্রায় শিশুর মতো, তার নিগূঢ় কোমলতা আমাকে ভ্রষ্টা করলো। ভুলে গেলাম সমস্ত আদর্শ আমার, যা-কিছু ভেবেছিলাম মানুষের কর্তব্য ব'লে। কী ভয়ানক জীবন! সত্যিকারের জীবন স'রে গেলো দূরে, পৃথিবী

স'রে গেলো আমাদের কাছ হ'তে। ও যেখানে যায়, আমিও যাই— তা-ই তো দরকার। অথচ প্রায়ই ও আগুন হ'য়ে উঠতো আমার ওপর —এই 'আমি', আমার নিরুপায় 'আমি'র ওপর। একটা অসুর যেন, অসুরই বটে— তোমায় বলছি আমি, ও মানুষ নয়।

'বলে, মেয়েদের আমি পছন্দ করি না। প্রেমকে নতুন ক'রে জাগাতে হবে— সকলে তা জানে। মেয়েরা চাইতে জানে, সবসময় চায়, শুধু নিরাপত্তা— একটা নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয়। অথচ সেই অবস্থায় যেই সে উঠলো, হৃদয় থেকে সৌন্দর্য তফাৎ হ'য়ে গেলো, অবশিষ্ট হ'য়ে প'ড়ে রইলো এক বিজাতীয় ঠাণ্ডা, বিবাহের পরের খাদ্য। আজকাল তো আরো বিশেষ ক'রে। এমন মেয়েও দেখেছি অবশ্য, যাদের মধ্যে ভাগ্যের লক্ষণ আছে— আর-কিছু না হোক, বন্ধু হিসেবে তাদের পেতে পারতাম— কিন্তু তার আগে যে কাঠের গুদোমের মতো একটা স্থূল পাশবিক ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার মধ্যে তাদের নিঃশেষ হওয়া চাই।

'আমি মন দিয়ে শুনি তার কথা— তার নিন্দা রটানোর মধ্যেও গরিমা খুঁজে বার করি। কী যেন জাদু আছে তার নিষ্ঠুরতায়। "আমার প্রপিতামহরা দূরান্তরবর্তী— তাঁরা ছিলেন স্ক্যাণ্ডিনাভ: নিজেদের পাঁজরা বিদ্ধ করতেন, পান করতেন নিজেদের রক্ত। আমি আমার সারা দেহে ছিদ্র কাটবো, উল্কি আঁকবো, হিংস্র হবো মোঙ্গলদের মতো— দেখো তুমি, আমি কেমন গর্জন ক'রে বেড়াই রাস্তায়-রাস্তায়। রাগে একেবারে পাগলই হ'য়ে যাবো— খবরদার, গয়না দেখিয়ো না আমাকে। গালিচার ওপর হামাগুড়ি দেবো, ডিগবাজি খাবো। আমার ঐশ্বর্যের আষ্টেপৃষ্ঠে রক্ত মাখানো চাই। খাটতে আমি কিছুতে রাজী নই…" কতো যে রাত এই অসুর আমার গলা টিপে ধরেছে আর আমরা গড়াগড়ি খেয়েছি, যুদ্ধ করেছি পরস্পর। রাত্রিতে ও প্রায়ই মাতাল হয়— কখনো রাস্তায়, কখনো বাড়িতে খুঁটির মতো নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ভয় দেখায়, ভয় দেখিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে ব'লে। "আমার ঘাড়খানা কাটা পড়বে একদিন, সর্বনাশ!" উঃ, কী সব ভয়ানক দিন, যখন ওরা ঘুরে বেড়াতো পাপের কালো মূর্তি নিয়ে।

'কখনো সে স্নিগ্ধ এক কথ্যবুলিতে ব'লে যায় মৃত্যুর কথা যা অনুতাপ

আনে— বলে দুঃখীরা নাকি বেঁচে আছে এখনো, কষ্টকর জঘন্য শ্রমও আছে, এমন বিদায়ও আছে নাকি যাতে হৃদয় টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়। যে-মুখ দিয়ে আমরা পান করি, মাতাল হই, সেই মুখেই ও কাঁদে হাউ-হাউ ক'রে আমাদের চারপাশে পশুর মতো যারা বেঁচে আছে, তাদের দুঃখের কথা ভেবে। মাতালগুলোকে ও অন্ধকার গলি থেকে তুলে আনবে— যে-মা শিশুর অনিষ্ট ক'রে বেড়ায়, তারই এক অদ্ভুত করুণা ওর মধ্যে। কচি মেয়েদের মতো ভক্তি নিয়ে ও যাবে ধর্মোপদেশ শুনতে। এমন ভান করে যেন রাজ্যের জ্ঞানের আলোকে ও আলোকিত। বাণিজ্য, শিল্পকলা, চিকিৎসাশাস্ত্র— সকল বিষয়েই পারদর্শী ব'লে সে ভান করে। আমি আর করি কী! ওকেই অনুসরণ করি।

'আমি লক্ষ্য করেছি সেই সমস্ত সজ্জা যাতে আপন মনে ও নিজেকে ঘিরে রাখতো— সেই সব কাপড়জামা, বিছানার চাদর, আসবাবপত্র। আমি ওকে ধার দিয়েছি অস্ত্রশস্ত্র, আরো-একটি শরীর। যা-কিছু ও স্পর্শ করেছে, নিজের জন্যে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে, সবই আমি দেখেছি। যখন মনে হয়েছে জড় চেতনার আমার দরকার, আমি ওকে অনুসরণ করেছি— ভালো হোক, মন্দ হোক— অদ্ভুত জটিল এক সুদূর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। স্থির জানি, ওর পৃথিবীতে ঢুকতে পারবো না কোনোদিন। যখন ও ঘুমোয়, ওর অতি-আদরের দেহটির পাশে আমি রাতের-পর-রাত, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা চেয়ে থেকেছি, খুঁজে ফিরেছি কেন ও বাস্তবকে এমন ক'রে এড়াতে চায়। এমন আশ্চর্য অভীপ্সা হয় না কারুর। বার-বার মনে হয়েছে, সমাজের পক্ষে ও রীতিমতো বিপজ্জনক হ'তে পারে। ওর ভয় পাবার কিছু নেই তাতে। এমন রহস্য ও জানে যাতে হয়তো জীবনটাকেই বদ্‌লে দেবে। কিন্তু ও বলে, তা সত্যি নয়, ও শুধু খুঁজেই গেলো। ধীরে-ধীরে ওর দাক্ষিণ্য আড়ষ্ট হ'লো সম্মোহনের পাকে, বন্দী করলো আমায়। কারুরই দেখি নি এমন আশ্চর্য শক্তি, এমন মরিয়া হ'য়ে ওঠার বল। তাইতেই ও নিজেকে ধারণ করেছে, রক্ষা করেছে, ভালোবেসেছে। কারুর সঙ্গেই ওর তুলনা করবো না— ওর দেবদূতকে না দেখে উপায় নেই, এই আমার বিশ্বাস। অন্য দেবদূত নয়। আমি ওর হৃদয়ে ছিলাম এক প্রাসাদের মতো, যা রিক্ত হ'য়ে গেছে, যেখানে কাউকে

খুঁজে পাবে না যে তোমার মতো নম্র। এই আমার সব। কেন যে ওর ওপর এতো নির্ভর করেছিলাম! কিন্তু আমার এই আলগা নীরস অস্তিত্ব নিয়ে কী করতে চেয়েছিলো ও? ওর সংস্পর্শে তা এতোটুকু উন্নত হ'লো না— এক যদি মরতে পারি! খুব বেশি বিরক্ত হ'লে হয়তো বড়োজোর বলি, "আমি বুঝি তোমাকে"— ও ঘাড় নাচাতো।

'এইভাবে দিনে-দিনে আমার দুঃখ বেড়েই গেলো, নিজেরি ভুল নিজের চোখে প্রকটতর হ'য়ে উঠছে। আমার চোখে তাদের সকলের সেই দৃষ্টির অনুতাপ যারা আমাকে দেখতে চেয়েছিলো স্থির একটি বিন্দুতে, অবশ্য যতোক্ষণ তারা আমাকে চির-নির্বাসন দেয় নি বিস্মৃতির অগম পারে। সেই স্নেহের জন্য ক্ষুধা আমার বেড়েই চলেছে। সেই চুম্বন, সৌহার্দ্যের আশ্লেষ— বেশ ছিলো সে-আকাশ, সুন্দর, গম্ভীর, যথেচ্ছ ঘুরে-ফিরে বেড়াতাম। সেখানে যদি কেউ আমাকে দরিদ্র ক'রে, অন্ধ-মূক-বধির ক'রেও ছেড়ে চ'লে যেতো— খেদ ছিলো না। তবু ইতিমধ্যেই আমি নিজেকে শক্ত করেছি, অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করেছি আমার জীবনে। আমাদের দু-জনকে দেখতাম আমি সরল হৃদয় দুটি শিশুর মতো, যারা আপন মনে ঘোরে-ফেরে বিষণ্ণতার স্বর্গে। আমরা মিলেও ছিলাম বেশ। আনন্দেই কাজ করেছি একত্রে। অতি আন্তরিক আদরের পর কখনো সে বলেছে, "কেমন মজা হয় বলো তো যদি আমি না থাকি তোমার কাছে— কী করবে তুমি? তোমার কাঁধে আমার হাত থাকবে না, তোমাকে আর রাখবে না তুমি আমার বুকে, তোমার চোখ দেখবে না আমার মুখ— কী করবে তুমি? কারণ আমি চ'লে যাবোই অনেক দূরে একদিন— অন্যদের সাহায্য করবো গিয়ে। হয়তো শুনতে তা খারাপ লাগবে তোমার, কিন্তু তা-ই যে কর্তব্য আমার প্রিয়!" ও চ'লে যাবে! সহসা কী হয়, ঘূর্ণিবায়ুর ওলট-পালটে আটকা প'ড়ে যাই, টলতে-টলতে মৃত্যুর হিংস্রতম অন্ধকারে পথ কাটি। ওকে শপথ করিয়েছি যে আমাকে ছেড়ে যাবে না ও— ছত্রিশবার এই শপথ ও করেছে, নাগরের শপথ। আমিও আচ্ছা মূঢ়, ওকে বলেছি, "বুঝি তোমাকে।"

'ওর প্রতি কোনো ঈর্ষা আমার ছিলো না কোনোদিন। আমাকে

ছেড়ে যাবে না ও, তাই তো জানতাম। কী হবে এবার? ও জানে না কিছুই, খাটতেও পারে না। বাঁচতে চায় স্বপ্নচারীর মতো। ওর ওই ঔদার্য আর সাধুতা নিয়ে কী অধিকার ও পাবে এই বাস্তব জগতে? যে-করুণার আশ্রয় চাই, তাকেও হারাই মুহূর্তের মধ্যে। ও আমাকে শক্ত ক'রে তুলবে— আমরা ভ্রমণে বেরুবো, শিকার করবো মরুপ্রদেশে, ঘুমবো নাম-না-জানা শহরের পথছায়ায় অযত্নে, অক্লেশে। জাগবো যখন, তার জাদুকরী শক্তির দাপটে রীতি-নীতি সব গেছে পালটে— পৃথিবী সেই সমান থেকেও মুক্তি দেবে আমায় আমার ইচ্ছায়, আমার আনন্দে, আমার অনুদ্বেগে। ওঃ, সেই দুঃসাহসী জীবন, যা কেবল শিশু-সিরিজের বই-এর পাতাতেই বিরাজ করে, নিজেকে ভোলবার জন্যে, মুক্তি পাবার জন্যে, যার কথা ভেবে আমি এতো দুঃখ পেয়েছি, তুমি কি তা দেবে আমায়? ও তা পারবে না। ওর আদর্শে আমি বিশ্বাস করি না। আশা রাখবার জন্যে, অনুতাপ সঞ্চয়ের জন্যে কতোই না বলেছে ও— তাতে আমার কী লাভ! তবে কি ভগবানকে ডেকেছে? বোধ হয় আমারই তাঁকে ডাকতে হবে। পড়েছি অতল খাদে, জানি না প্রার্থনা কাকে বলে।

'ও যদি বলে ওর দুঃখের কথা, সেগুলো ধোঁকার মতো মনে হবে না আমার? আমাকে খেপিয়েই আছে— এই পৃথিবীর যা-কিছু আমায় স্পর্শ করেছে, তার সকল-কিছু নিয়ে আমাকে লজ্জা দেওয়ার প্রয়াসে ওর সময় কাটে। এমন রাগ দেখায় যে আমি কেঁদে ফেলি।

' "এই যে ফিটফাট যুবকটিকে দেখছো, ঢুকছে নিঃশব্দে সুন্দর বাড়িটির মধ্যে, নাম এর ডুভাল, ডুফুর, আঁর্মা, মোরিস— আমি কি জানি না? এমন পাপী গর্দভটিকে একটি নারী সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলো— আজ সে মৃতা, এতোদিনে স্বর্গে নিশ্চয়ই কোনো মুনি-ঋষির আসনে অধিষ্ঠিতা। তুমিও আমায় মারবে তেমনি ক'রে যেমন এই লোকটা মেরেছে সেই নারীকে। আমাদের মতো যারা সহৃদয়, তাদের নিয়তিই এই।" কতো বলবো, কখনো-কখনো ও মানুষের সমস্ত চলাফেরাকে মনে ক'রে বসে অপরূপ এক প্রলাপের খেলনা-বিশেষ। হাসে বীভৎসভাবে, অনেকক্ষণ ধ'রে— পরে হঠাৎ এমন আচরণ আরম্ভ করে যেন ও

অল্পবয়সী কোনো মা কিংবা এক আদুরে বোন। আর-একটু কম বর্বর যদি ও হ'তে পারতো, বেঁচে যেতাম আমরা দু-জনে। আর নরম হ'লে তো আরো মর্মান্তিক— তাইতেই তো নিজেকে সমর্পণ করলাম। উঃ, কী মূঢ় আমি!

'হয়তো একদিন হঠাৎ ও অদৃশ্য হ'য়ে যাবে অপূর্বভাবে— তবু স্বর্গে যদি যেতে হয়, তার আগে এই জ্ঞানটুকু আমার হওয়া চাই যে বন্ধুবরের চেয়ে অনুমানে আমার ঘাটতি আছে।'

সংসারী হওয়ার কতো মজা!

জাদুকরী ক্রিয়া

আবার আমি। আমার মূর্খতার আরো-একটি কাহিনী।

বহুদিনের গর্ব আমার, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত নিসর্গ শোভার ওপরই আছে আমার দখল— আধুনিক কাব্য ও চিত্রকলার গগনস্পর্শী খ্যাতির আড়ালে জেনেছি তার চূড়ান্ত অসারতা।

আমাকে টানে অর্থহীন ছবি, দরজার ওপর দিকটা, অসারগর্বীর পট, বিজ্ঞাপন-ফলক, লোক-শিল্পের রংচং, সেকেলে সাহিত্য, গির্জার ল্যাটিন, বানান-ভুলে ভর্তি আদিরসের বই, প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী, রূপকথা, শিশুদের বই, রং-চ'টে-যাওয়া কাব্য-গীতি, সরল আস্থায়ী, অমার্জিত ছন্দ।

স্বপ্নে দেখেছি ধর্মযুদ্ধ, অর্থহীন আবিষ্কারের আশায় দেশান্তর যাত্রা, ইতিহাসশূন্য রাষ্ট্র, ধর্মে-ধর্মে গুমোট লড়াই, নীতি-সংক্রান্ত বিপ্লব, জাতিতে জাতিতে ও মহাদেশে কতো ওলট-পালট, বিশ্বাস করেছি সমস্ত জাদুমন্ত্রে।

বার করেছি স্বরবর্ণের রং— আ কৃষ্ণ, অ শ্বেত, ই রক্ত, ও নীল, উ সবুজ— নিরূপণ করেছি প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের গতি-প্রকৃতি। আর সহজাত প্রেরণার ছন্দেই আজ আবার লালায়িত হয়েছি কাব্যিক এমন একটি সুগম ক্রিয়াপদ আবিষ্কার করতে যা একদিন-না-একদিন প্রযোজ্য হ'তে পারবে সমস্ত অর্থে। এই আমি অনুবাদের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ক'রে রাখলাম।

প্রথমে সে ছিলো শুধু সমীক্ষণ। রূপ দিয়েছি মৌনকে, বাণী দিয়েছি রাত্রিকে, লিখে গেছি অনির্বচনীয়কে— স্থৈর্যে বেঁধেছি চিরচঞ্চল ঘূর্ণিকে।

যেখানে অনেক দূর পাখিরা, ভেড়ার পাল, গাঁয়ের মেয়েরা
কী পান করবো আমি সেইখানে, নতজানু এই উলুখড়ে,
আজ এই বাদামগাছের বনে নরম বাকলে ভেজা
ঝাপসা এই বিকেলের উষ্ণ সবুজ কুয়াশায় ?

কী পান করবো আজ তরুণী এ-ওয়াজের* তীরে—
বাণী নেই পাদপের, পুষ্পরিক্ত তৃণদল, আকাশ ঢেকেছে :
কী পান করবো বলো, হলদে লাউয়ের দলে, আমার কুলায় হ'তে দূরে
কী পান করবো বলো প্রিয়া,
সে কোন সোনালি সুরা, যাতে ঘাম ঝরবে তোমার।

ঝোলের চামচ আঁকি, বিজ্ঞাপন পান্থ-নিবাসের
—এলো ঝড় আকাশ মথিত ক'রে সহসা। সন্ধ্যায়
কুমারী বালুর পুঞ্জ শুষে নেয় অরণ্যের রস,
দেবতার হাহাকার বাতাসে-বাতাসে
ছুঁড়ে দেয় সরোবরে তুষার-কণিকা ;

—সেখানে, সজল চোখে, সোনা দেখে— পান করা হ'লো না আমার।

ভোর চারটেয় গ্রীষ্মবেলায়
প্রেমের নিদ্রা তখনো জোর—
কুঞ্জের পথে উড়ে উবে যায়
গত সন্ধ্যার গন্ধঘোর।

ওইখানে ওই মস্ত তাদের চত্বরে
জলে সূর্যের আলো যেন কোনো রূপকথার—
আস্তিন তুলে এই সকালেই কাজ করে
শ্রমিক সূত্রধার।

শেওলার মরু ছেঁচে ওরা ধীর মনে
গ'ড়ে তোলে কতো দামি তক্তার আচ্ছাদন,
কবে একদিন কোন মঙ্গল-লগনে
নগরী ধরবে মিথ্যা আকাশ-রঞ্জন!

* ওয়াজ—Oise, নদীর নাম।

এই মনোহর মজুরগণের তরে,
ব্যাবিলনিয়ার অধীশ্বরের দাস হ'য়ে থাকে যারা,
ভেনাস, তোমার অনুরাগীদের ত্যাগ করো ক্ষণতরে
যাদের হৃদয় চেনে নি কিছুই মুকুট ছাড়া।

এই শ্রমীদের জন্যে রাখাল-রানী
আনো ভ'রে আনো জীবনরসের পাত্র কানায়-কানায়—
ওদের শক্তি শান্তিতে পাক বাণী
দুপুর-সূর্যে সাগর-স্নানের স্নিগ্ধতায়॥

আমার ক্রিয়াপদের এই রসায়নে কাব্যের যতো পুরোনো ভাঙাচোরা জিনিসের ভূমিকা।

নিজেকে সইয়ে নিয়েছি সরল মতিভ্রমে— সত্যি, দেখেছি আমি কারখানার জায়গায় মসজিদ, দেবদূতের-পরিচালনায় যন্ত্র-সংগীতের বিদ্যালয়, আকাশপথে শকটের মিছিল, হ্রদের গভীরে বৈঠকখানা; কতো যে দৈত্য, কতো রহস্য! কী এক প্রহসনের নাম চোখে আমার বিভীষিকা ঘনিয়ে তুলেছে।

এ ছাড়া শব্দের ছায়াবাজিতে বুঝিয়েছি কুহকের যতো কূটতর্ক।

অবশেষে আমার চেতনায় এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে খুঁজে পেলাম পবিত্রকে। তৃষ্ণায় ছটফট করেছি, আক্রান্ত হয়েছি প্রবল জ্বরে— ঈর্ষা করেছি পশুর সুখ, শুঁয়োপোকার নিরপরাধ বিস্মৃতিলোক, গন্ধমূষিকের কৌমার্যময় তন্দ্রা।

তিক্ততায় ছেয়ে গেলো আমার চরিত্র— কয়েকটা গাথার মতো কবিতায় পৃথিবীকে বিদায় জানালাম।

উচ্চতম মিনারের গান

হোক সময়, সময় তার
হৃদয় প্রেমে পড়বে যার।

কতো যে আমি সয়েছিলাম
কিছুই নেই স্মরণে,
যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ভার
মিলায় দূর গগনে।
ধমনী ক'রে অন্ধকার
তৃষ্ণা জলে রুগ্নতার।

হোক সময়, সময় তার
হৃদয় প্রেমে পড়বে যার।

এমনিতর গুল্মখেতে
নগ্ন হ'লো বিস্মরণ,
কী তার আছে দেবার, শুধু
গন্ধধূপ, শুকনো খড়।
নিস্বনিত নোংরামির
নেশায় বুঁদ মাছির ভিড়।

হোক সময়, সময় তার
হৃদয় প্রেমে পড়বে যার।

আমি ভালোবাসি মরুভূমি, শুকিয়ে-যাওয়া ফলের বাগিচা, বিবর্ণ ম্লান দোকান, ঠাণ্ডা-হ'য়ে-আসা পানীয়। নিজেকে টেনে নিয়ে যাবো পচা দুর্গন্ধের অলিগলি দিয়ে বন্ধ আঁখির কাছে, উৎসর্গ করবো সূর্যের চরণে, আগুনের যিনি দেবতা।

'সেনাপতি, ধ্বংসস্তূপ পরিখার আড়ালে এখনো যদি ভাঙাচোরা কোনো কামান তোমার অবশিষ্ট থাকে, আমাদের তুমি বোমা মেরে দাও এই শুকনো ভূমিখণ্ডের ওপর। ফাটিয়ে দাও চমৎকার দোকানের কাচের জানলায়, বৈঠকখানায়— শহরকে ভক্ষণ করাও তাদের ভস্মশেষ।

কুলকুচোর ঘড়-ঘড় শব্দে অম্লজান জারিত করো। জলন্ত মণির গুঁড়োয় কুঞ্জবন ছারখার করো।'

দংশ আসুক সরাই-এর পেছনে প্রস্রাবখানার গন্ধে মাতাল হ'য়ে, মূত্রবৃদ্ধিকারক গুল্ম-উদ্ভিদের প্রেমিক সে— একটু রশ্মি ছিটিয়ে দিয়ে যাক।

বুভুক্ষা

রুচি যদি থাকে কিছুতেই,
তবে মাটিতেই আর নুড়িতেই—
শুধু হাওয়া খেয়ে থাকি দিন-রাত
খাই পাথর, কয়লা, ইস্পাত।

হায় বুভুক্ষা, ওলটাও,
তুমি চ'ষে বেড়াও
ভুষি-তুষ-তৃণদল,
চুম্বন করো ধুতুরার নীল উজ্জ্বল হলাহল ;

ঝামা আর ভাঙা পোড়া ইট খানখান,
ভক্ষণ করো গির্জার বুড়ো পাথর বিলীনজ্যোতি,
ধূসর উপত্যকায় রোপিত যে-গম হারানো নাম,
বিস্মৃত কোনো বন্যা-তাড়িত যে-নুড়ি লুপ্তগতি।

নেকড়ে যেমন চেঁচায় পাতার আড়ালে,
নরম রঙিন পাখা ছিঁড়ে ওপড়ায়
মুরগির ভোজে যখন মনটা মাতালে—
আমিও তেমনি নিজেকেই ধ'রে খাই।

ফল বলো আর শাকশব্জিই বলো
খাবার থালায় যাবেই তাদের চেনা,

কিন্তু ঝোপের মাকড়শাটার খিদে
ফুল ছাড়া আর কিছুতেই মিটবে না।

নির্ভাবনায় তাই ঘুম দিই ; সলোমন মহারাজের
যজ্ঞবেদীতে টগবগ করে জল :
সে-ঝোল তরল মরচে পুড়িয়ে ছুটেছে সকল পথের
পারে যেইখানে পাতালপ্রবাহ গর্জায় কলকল।

অতএব হে সৌভাগ্য, হে স্বরূপ, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছি আমি আকাশের এই নীলিমা থেকে— নীলিমা তো নয়, কালিমা— এবং বাঁচলাম স্বপ্রকাশ আলোর স্বর্ণে চিকচিক করতে-করতে। আনন্দ থেকে নিয়েছি এমন একটি ভঙ্গিমা যা যেমন দ্বন্দ্বসমাকুল, তেমনি পথভ্রষ্ট।

আবার ফিরে পেয়েছি তারে!
কারে? —শাশ্বতীরে।
সমুদ্র সে সূর্যে মেশে
মিলন-মন্দিরে।

মৃত্যুজয়ী আমারো মন
তোমারি ঋতে চলে,—
যদিও রাত প্রবঞ্চিত,
আগুনে দিন জ্বলে।

চতুর তুমি, তোমাতে তাই
যত্নে পরিহৃত
প্রাকৃত সুখ-দুঃখাবেগ—
তুমি অকুণ্ঠিত।

আশার পথে কখনো নয়,
উদয়-পথে নয়।

সাধ্য আর সাধনা, সবই
বিড়ম্বনাময়।

আগামী চিরকালের তরে
আছে তো জানো প্রিয়,
রেশমে ঢাকা আগুন সেই
তোমার বহনীয়।

আবার ফিরে পেয়েছি তারে!
কারে? —শাশ্বতীরে।
সূর্য আর সমুদ্রের
মিলন-মন্দিরে!

অপূর্ব এক আজগুবি গীতিনাট্য হ'য়ে বসেছি: সুখের পথেই দেখি বাঁধা সকলের অদৃষ্টখানি। কর্মটাই জীবন নয়, আনাড়ির মতো একটা কোনো বল আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা শুধু, সংযমের বিনষ্টি মাত্র। নীতি-কথা মানেই মস্তিষ্কের পঙ্গুতা।

আমার মনে হয়, সকলেরই বহু জীবনে বাঁচবার প্রয়োজন আছে। ওই যে ভদ্রলোক, উনি নিজেই জানেন না কী করেন। আমি তো বলবো উনি এক দেবদূত। ওঁর পরিবার কুকুরের আশ্রয়-স্থল। হাজার লোকের সামনে তাদেরই জীবনের কোনো-একটি অনিবার্য মুহূর্ত সম্বন্ধে এই খাঁটি কথা আমি ব'লে যাবো গলা ফাটিয়ে। এই একই ভাবে শূকরকেও ভালোবেসেছি আমি।

মূঢ়তার যতো মিথ্যে আড়ম্বর আছে, যাতে মানুষ নিজেকে বেঁধে রাখে, তার কোনোটাই আমাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। তাদের আমি আওড়াতে পারি ফিরে-ফিরে— সব কায়দা জানা আছে।

স্বাস্থ্য ভাঙতে বসেছে— কী এক মহাভয়ে আচ্ছন্ন হলাম। তন্দ্রায় অবশ হ'লো শরীর— ঘুমোলাম দিনের-পর-দিন। যখন উঠলাম, করুণ স্বপ্নের রেশ তখনো নাড়া দেয়। আমার এই পাকা দেহটা মৃত্যুতে টুপ ক'রে ঝ'রে পড়বার জন্যে প্রস্তুত— ঝঞ্ঝাকুল পথে শৈথিল্য আমাকে

টানে পৃথিবীর প্রান্তদেশে, ঘূর্ণি আর আঁধারের মাতৃভূমি সিমেরির* রাজ্যে।

যাত্রা করতেই হ'তো আমাকে— যতো মোহ জমেছে এই মাথায়, তাদের তো ঝেড়ে ফেলতে হবে। সাগরের উত্তাল তরঙ্গে-তরঙ্গে ধৌত হ'লো সান্ত্বনার ক্রুশ— আমার কলঙ্ক কি ধোবে না সে? ইন্দ্রধনুর দ্বারা অভিশপ্ত আমি,— সুখই আমার নিয়তি, আমার হাহাকার, আমার অসহ যন্ত্রণা। আগাগোড়া জীবনটা আমার এতো অসীম হ'য়ে রইলো যে কপালে আমার নেই কোনো সৌন্দর্য বা শক্তিকে আঁকড়ে ধরা।

আর সেই সুখ! তার দাঁত, হতবল একমাত্র মৃত্যুতে, আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে ঘন আঁধার পল্লীর কুক্কুটের গীতিতে, সকালের চেতনায়, খ্রীস্টের আসার পথে!

ঋতুর দল, বলো দুর্গদল—
কোন হৃদয়ে নেই তার ভুলের ছল?

সুখের জাদুকরী অনুধ্যানে
রাখি নি কোনো ফাঁকি কোনোইখানে—

বারংবার তাকে প্রণাম আজ
যে-গান গায় 'গল্' মোরগরাজ।

ঈর্ষা নেই আর ঈর্ষা নেই—
জীবন জমা হ'লো সেই ধনেই!

মন্ত্র তার টানে শরীর-মন,
প্রয়াসে এলোমেলো নাচে মরণ।

* Cimmeria : গ্রীক পুরাণে উক্ত সূর্যহীন চিরতিমিরের দেশ। এইখানে ওডিসিয়ুস মৃতদের প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

ঋতুর দল, বলো দুর্গদল !

ভঙ্গ দেবে কি সে, যেই সে ছাড়া !
মৃত্যুদূত তাকে করবে তাড়া।

ঋতুর দল, বলো দুর্গদল !

ও-সব শেষ হ'য়ে গেছে কবে। এখন জেনেছি কী ক'রে নমস্কার করতে হয় সুন্দরকে।

মনে পড়ে আমার শৈশবের জীবন, চিরকেলে সেই সিধে রাস্তা, স্থির এক অতিপ্রাকৃত গাম্ভীর্য, বীতস্পৃহ যে-কোনো বৈরাগীর চেয়েও— না আছে বন্ধু, না আছে কোনো দেশ, এই নিয়েই তার গৌরব। কী পাগলামিই ক'রে এসেছি! আজ নিজেকে নিজেই দেখছি।

যথেষ্ট যুক্তি আছে আমার যদি আমি এইসব নিরীহ ভালোমানুষদের গালাগালি দিই যারা আদর পাবার এতোটুকু অবকাশ ছাড়লো না জীবনে, আমাদের মেয়েগুলোর স্বাস্থ্য আর সতীত্বের পরগাছা হ'য়ে বেঁচে রইলো— যদিও জানি, আমার কথা মানবে না সেই মেয়েরাই আজ।

যুক্তি আছে আমার ঘৃণা করার— নইলে পালাচ্ছি কেন?

আমি পালাচ্ছি।

তাইতেই আমার কথা ব'লে যাচ্ছি!

কালও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি, বলেছি, 'আকাশ! এতো তো অভিশপ্ত আমরা এই তলায়— এটাও কি যথেষ্ট নয়? ওদের দলভুক্ত হ'য়ে থেকেছি আমি কতোবার— জানি সব ক'টাকে। আমরা পরস্পরকে চিরকালই চিনতে পারি, একে অন্যকে ক্লান্ত করি। বদান্যতা কাকে বলে, আমরা জানি না। তা সত্ত্বেও আমরা ভদ্র, বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো।' এটা কি খুব একটা আশ্চর্য কথা? বিশ্ব, বণিকের দল, সরল অকপট লোকেরা। সম্মান আমাদের কেউ কেড়ে নেয় নি— কিন্তু নির্বাচনে যারা জয়ী হ'লো, কী ক'রে তারা আমাদের গ্রহণ করবে? আবার এমন অনেকে আছে যারা রূঢ়, অভদ্র, অথচ বেশ আনন্দিত, মিথ্যেকার জয়ীর দল— ওই হতভাগাগুলোকে তীরে তোলবার জন্যে আমাদের দরকার মস্ত বড়ো সাহসের, এক বিরাট মানবতার। ওরা শুধু জয়ীই হ'লো, আশীর্বাদ করতে শিখলো না।

বুদ্ধির দু-একটা কণা যখন ফিরে পাই মুহূর্তের জন্যে, যদিও দেখতে না দেখতে আবার মিলিয়ে যায় তারা, তখন দেখি, আমার মনখারাপ আমাকে ততো তাড়াতাড়ি গ্রাস করতে পারে না কারণ আমি প্রতীচীর অধিবাসী। হায়, পশ্চিমের জলাভূমি! তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে

আমি বিশ্বাস করি আলো গেছে উল্টে, রূপ হয়েছে পাংশু, গতি চিনেছে ভুল পথ। —ভালো! এখন আমার মন চায় তার অংশ নিতে যে-অকথ্য নিষ্ঠুরতা প্রাচ্য তার ধ্বংসের আরম্ভ হ'তে আজ পর্যন্ত সহ্য ক'রে এসেছে। মন আমার তা-ই চায়।

মিলিয়ে গেলো বুদ্ধির সেই কণিকা! মন আবার কর্তা, এখন সে চায় পশ্চিমেই থাকতে। যা চাই, তা যদি ফলাতে চাই তো আগে ইচ্ছার মুখটা বন্ধ করতে হবে।

শয়তানকে পাঠিয়েছি শহীদদের হস্তরেখা, আর্টের রশ্মি, আবিষ্কর্তার অহংকার, দস্যুর উল্লাস। মুখ ফেরাই প্রাচীর দিকে, সেই প্রথম ও শাশ্বতী প্রভার দিকে। মনে হয়, প'ড়ে আছে অমসৃণ আলস্যের এক স্বপ্ন!

তবু আমি ভুলেও চাই নি যে বর্তমানের যন্ত্রণাকে ফাঁকি দিয়ে আনন্দ ক'রে বেড়াবো। কিন্তু এই বঞ্চনা কি কিছু কম বাস্তব, না কিছু কম অসামান্য যে মানুষ তার বিজ্ঞানের এই জয় ঘোষণা নিয়ে, এতো নানান ভূমিকার অভিনয়ে নেমে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্তূপ দিনে-দিনে ফেনিয়ে তুলেও এর চেয়ে ভালো বাঁচতে পারলো না? সূক্ষ্ম, অথচ মূঢ় এক যন্ত্রণা— আমার আত্মিক পথভ্রষ্টতার তা-ই তো উৎস। বোধ হয়, প্রকৃতিরও উচিত ছিলো মন-খারাপ করা। খ্রীস্টের সঙ্গে-সঙ্গেই আত্মাভিমানীর জন্ম।

তার কারণ কি এই নয় যে আমরা চাষ করি কুয়াশায়, জ্বরের সঙ্গে ভক্ষণ করি জলীয় শাকশব্জি? তা ছাড়া মাতলামি, তামাক, অজ্ঞতা, পৌত্তলিকতা— এর কোনটা নেই বলো তো সেই আদিম জন্মভূমি প্রাচীর প্রজ্ঞা ও চিন্তায়? কিন্তু কথা হচ্ছে, আজকের এই আধুনিক জগতেও অনুরূপ গরল কী ক'রে উৎপন্ন হয়!

গির্জার গুরুরা বলবেন: বুঝলাম, তুমি 'ইডেনে'র কথাটা তুলতে চাও— মনে রেখো, প্রাচ্যের কোনো জাতির ইতিহাসেই কিছু নেই তোমার জন্যে। —মানছি, 'ইডেনে'র কথাই আমি ভাবছিলাম। কিন্তু কী ভেবেছিলাম, আদিম জাতির পবিত্রতা— হায় রে স্বপ্ন!

দার্শনিক বলবেন: জগতের বয়স নেই। মানুষের সভ্যতা শুধু জায়গা বদল করছে। পাশ্চাত্ত্যে আছো তুমি, ইচ্ছে করলেই প্রাচ্যে

তোমার বাস উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারো। এবং সেখানে ভালোভাবেই বাস করবে, কেবল যা একটু প্রাচীন ব'নে যেতে হবে। বশীভূত হ'য়ে যেয়ো না যেন।

দার্শনিকমশাই, যেমন তোমার প্রতীচী, তেমনি তুমি!

মন আমার, সাবধান হও। হিংসাত্মক নমস্কারের দলে ভিড়ো না। নিজেকে ঠিক রাখো। কিন্তু কই, বিজ্ঞান তো আমাদের বেলা ততো এগোচ্ছে না!

—কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার মন ঘুমোচ্ছে।

এই মুহূর্তেই যদি তাকে জাগিয়ে দেওয়া যায়, আমরা সত্যে পৌঁছে যেতে পারি তাড়াতাড়ি, যা হয়তো তার ক্রন্দনরত দেবদূতদের বেষ্টনীতে আমাদের ঘিরে ফেলবে!...আর যদি আমার মন জাগানোই ছিলো এতোক্ষণ তো বুঝবো, আমার সহজাত অনিষ্টকারী বৃত্তিদের আমি ছেড়ে আসতে পারি নি কোনো স্মরণাতীত কালের উৎসবে!...আর যদি তা চিরকালই এমনি জাগানো আছে, আমি যাত্রা করবো পূর্ণ প্রজ্ঞায়!...

পবিত্রতা!

জাগরণের এই ক্ষণটিই আমাকে দেখালো সেই পবিত্রতার আলো—আত্মাই মানুষকে টানে ঈশ্বরের পথে!...

কী মর্মভেদী দুর্ভাগ্য!

মানুষের শ্রম! সেই বিস্ফোরণেই আমার অতল কালো গহ্বর থেকে-থেকে চমকে ওঠে।

'মিথ্যা দেমাক তো নয়— চলো বিজ্ঞানের পথে, চলো সমুখ পথে।' আজকের হোতা, মানে সকলেই, চেঁচাচ্ছে এমন ক'রে। তবুও তো অলস আর বজ্জাতদের মৃতদেহগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ছে অন্যদের হৃদয়ের ওপর। ...আর-একটু জোরে পা ফেলো— তাড়াতাড়ি! —রাত্রির ওই গভীরে শাশ্বতী লুকিয়ে রাখে ভাবীকালের পুরস্কার। আমাদের কপালে কি কিছু জুটবে না?...

আমি কী করতে পারি? কাজ জানি; কিন্তু বিজ্ঞান বড়ো ধীরগতি। লাফাতে-লাফাতে ছুটুক প্রার্থনা, গর্জন করুক আলো— তা হ'লে তাদের চিনতে স্থবিধে হবে। খুবই সোজা কথা— কিন্তু বেজায় গরম হচ্ছে। কে জানে, আমাকে না নিয়েই হয়তো চ'লে যাবে ওরা। কিন্তু আমারো কর্তব্য আছে— সেগুলো দেখিয়ে, পাশে সাজিয়ে রেখে আমিও তো গর্ব বোধ করতে পারি অন্যদের মতো।

আমার জীবনে তো আর কিছু নেই, তাকে ব্যবহার করা হ'য়ে গেছে। এখন এসো, কল্পনার চাষ করি, কুড়েমি করা যাক। —হায়, কী করুণা! এ-যাত্রা বেঁচে যাবো আমোদ ক'রে, কিম্ভূতকিমাকার প্রেম আর আজগুবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বপ্ন দেখে, নালিশ করবো, তুমুল তর্ক বাধাবো পৃথিবীর স্বরূপ নিয়ে, হাতুড়ে ডাক্তার নিয়ে, সন্ন্যাসী নিয়ে, শিল্পী নিয়ে, ডাকাত নিয়ে— এমন কি পুরুতগুলোরও আসল চেহারাটা কী, সে-তর্কও বাদ যাবে না! ধূপের প্রবল গন্ধ এমন ক'রে ফিরে এলো আমার হাসপাতালের শয্যায়— শহীদ যে, তার আত্মনিবেদনে পূতগন্ধী দ্বারিক সে।

ওইখানে চিনতে পারি আমার শৈশবের কলুষিত শিক্ষাকে। তারপর? কুড়িটি বছর পেরিয়ে আসা। সকলেই আসে।

না— আজ আমার বিদ্রোহ মৃত্যুর বিরুদ্ধে। গর্বের চোটে কাজটা খুবই হালকা মনে হচ্ছে। যে-বঞ্চনা ক'রে গেলাম পৃথিবীকে, তার যন্ত্রণা

যেন ক্ষণস্থায়ী হয়। চরম মুহূর্তে, আক্রমণ চালাবো এদিক-ওদিক, ডাইনে-বাঁয়ে···

তারপর, হায় রে মন, শাশ্বতীকে কি হারাবো একেবারে!

সকাল

স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো কোনো কমনীয় যৌবন, শৌর্যপূর্ণ ও কল্পনায় কল্পিত, আমি পেলাম না একটি দিনও! হায় অভাগ্য, এমন কী ভুল করেছি, কী সে-পাপ, যার যোগ্যতায় অর্জন করলাম এতো বড়ো দৌর্বল্য! তুমি তো ভান করো, বলতে চাও যে জন্তুরাও দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে, রোগীরা গুমরোয় হতাশ্বাসে, দুঃস্বপ্নে আকুল হয় মৃতরা— আমার পতন আর ঘুমের ইতিহাস বর্ণনা করো না একবার! আমি নিজেকে আর ভোলাতে চাই না বিবাগীর ওই অবিরাম 'পেটার' আর 'আভে মারিয়া'য়। আর বলতে পারি না আমি!

তবু আমার বিশ্বাস, নরকের সঙ্গে সম্পর্ক এইখানেই শেষ হ'লো না। নরক জায়গাটা মন্দ নয়— বহু প্রাচীন, তবে মানুষের সন্তানরা তার দরজা খুলতে জানে।

একই মরুভূমিতে, একই রাত্রে, আমার ক্লান্ত চোখ বার-বার জেগে ওঠে শুক্তিবর্ণ তারায়-তারায়; জীবননাথ যদিও নিশ্চল, জাদুকর সেই তিন মূর্তি, হৃদয়, আত্মা, চেতনা, অহরহ আকুল হয় বিদ্রোহের আবেগে। কবে যাবো আমরা ওই কঙ্কর-বিছানো সৈকত ও শৈলশৃঙ্গের পাশ দিয়ে, নমস্কার করবো নতুন শ্রমের জন্মকে, নতুন প্রজ্ঞাকে— পালাবে বর্বর দস্যুদল, অন্ত হবে কুসংস্কারের! সেদিনই ধরণীতে হবে প্রথম খ্রীস্টোৎসব, প্রথম পূজার দিন।

আকাশ গেয়ে উঠলো পথিকের চলায়-চলায়। বন্দী যারা, তারা যেন জীবনকে আর অভিশাপ না দেয়।

হেমন্ত এরই মধ্যে! কিন্তু ক্ষোভ কেন শাশ্বত সূর্যকে নিয়ে, যদি নিজেরাই মেতে রয়েছি দিব্য বিভার আবিষ্কারে? দূরে কোথায় মানুষ মরছে ঋতুর পরে ঋতুতে!

হেমন্ত। আমাদের নৌকোখানা অনড় কুজ্ঝটিকা ভেদ ক'রে ছুটেছে দুঃখের বন্দরের মুখে— আকাশে এক বিশাল নগরী কলঙ্কিত হ'লো আগুনে আর পাঁকে। আঃ, আমিও ক্রুশবিদ্ধ ছিন্ন কুটি-কুটি চীরে, বৃষ্টিতে ভেজা চুপসোনো রুটিতে, মাতলামি আর হাজার-হাজার প্রেমে। এতো লক্ষ-লক্ষ হৃদয়, এতো অজস্র মৃতদেহের যে রানী, সে-পিশাচী কি ছাড়বে কাউকে?—বিচার সবারই হবে। নিজের দিকে ফিরে তাকাই, দেখি চামড়াটা প্লেগ আর কাদায়-কাদায় যেন ছিবড়ে হ'য়ে গেছে, আমার চুলে-বগলে যেন আগুনের হল্‌কা। আর এই যে হৃদয় আমার, নিজেকে বিছিয়ে রেখেছে নাম-না-জানা নিঃসাড় চিরতরুণদের মধ্যে, সেখানেও কী প্রচণ্ড উত্তাপ! মরণ কি চেনে না আমায়? কী নৃশংস আহ্বান! ঘৃণা, আমি ঘৃণা করি দুঃখদারিদ্র্য।

আবার শীতের ভয় কখনো আমার কাটে না, কেননা শীত হ'লো আরামের ঋতু।

কখনো মনে হয়, আকাশের ওই অন্তহীন বেলাভূমি যেন উৎফুল্ল বহু শ্বেত জাতিতে সমাকুল হয়েছে— ওপরে ওইখানে, এক বিশাল সোনার তরী তার বহুবর্ণবিচিত্রিত চন্দ্রাতপ দোলায় সকালবেলার হাওয়ায়। আমার কল্পনা স্পর্শ করেছে সমস্ত উৎসব, সকল জয়ের আনন্দ, রাজ্যের নাট্যকাহিনী। আমি আবিষ্কার করতে চেয়েছি নতুন-নতুন ফুল, নতুন তারা, নতুন মাংস, নতুন ভাষা। নিজেকে চিনেছি অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী ব'লে। এখন এতো কল্পনা, এতো স্মৃতির কবর দাও, আর কী! আমার শিল্পের ও কথকতার খ্যাতির এমন একটা সুযোগ হারালাম।

আমি, যে-আমি নিজেকে ব'লে এসেছি ভূত বা দেবদূত, সবরকম নীতি থেকে যে-আমি পলাতক, সেই আমাকে কে আজ ফিরিয়ে দিলো

মাটির হাতে, সঙ্গে দিলো এমন এক কর্তব্যের ভার যাকে খুঁজে ফিরতে হবে, এমন অকরুণ এক বাস্তব যাকে আঁকড়ে না ধ'রে উপায় নেই। চাষা কোথাকার!

ছলনা করছি কি নিজেকে? আমার কপালে দয়া কি মৃত্যুরই সহোদরা?

থাক গে, ক্ষমা চাইলেই মিটে যাবে আমার এই মিথ্যায় পরিপুষ্টির পাপ। চলো যাই।

কিন্তু একটি হাতও উঠলো না বন্ধুর মতো— সহায় হবে কে?

সত্যি, এলো যে-সময়, না মেনে উপায় নেই, তার মুখ বড়ো কঠিন।

কারণ আমি বলতে পারি, জয় অবশেষে আমাকে ধরা দিলো! দাঁতের কিড়মিড় শব্দ, আগুনের হিসহিস ও বিষিয়ে-ওঠা হা-হুতাশ এতোক্ষণে নিজেদের সংযত ক'রে আনে— নোংরা স্মৃতির ভিড় মুছে যায়। যা-কিছু অনুতাপও ছিলো অবশিষ্ট, পাততাড়ি গুটোয়। কাকে ঈর্ষা না করেছি আমি! —সন্ন্যাসী, চোর-ডাকাত, মরণের বন্ধুগোষ্ঠী, এমন কি পেছিয়ে-পড়া হতভাগ্য যারা, তারা সকলেই আমার ঈর্ষার পাত্র ছিলো। হায় রে অভিশপ্ত, নিজের ওপর প্রতিহিংসা জাগে আজ।

একেবারে আধুনিক হ'য়ে যাওয়া চাই।

ভক্তি-সংগীত আর নয়: একবার যখন চলেছো, গতিটি ছেড়ো না। কঠিন রাত। শুকিয়ে-ওঠা রক্ত মুখখানা আমার ধূমায়িত ক'রে দেয়। পেছনে তো কিছুই দেখছি না এক ওই বীভৎস চারাগাছটি ছাড়া। মানুষে-মানুষে লড়াইয়ের মতোই আধ্যাত্মিক লড়াইটাও সমানই পাশবিক —একমাত্র ন্যায়ের পথেই ঈশ্বর পান আনন্দ।

হাজার হ'লেও, রক্ষী সে-ই। তেজ ও স্নেহের ফল্গুকে গ্রহণ করো মনে। ভোরবেলা ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন হ'য়ে আমরা পৌছবো আশ্চর্য নগরীতে।

হাতের কথা কী বলছিলাম, সখি! আমার একটা মস্ত বড়ো সান্ত্বনা এই যে, আগাগোড়া মিথ্যা-ভরা ওই সব পুরোনো প্রেমের কাহিনী শুনে

আমি হোহো ক'রে হেসে উঠতে পারি, লজ্জায় কুঁকড়ে দিতে পারি ওই-মিথ্যাভাষী দম্পতিদের— কেননা ওই নিয়ে নারীদের নরক আমি দেখে নিয়েছি। এখন যদি চাই দেহের মধ্যে, মনের মধ্যে সত্যকে ধারণ করতে, সেই দাবি ব্যর্থ হবে না আমার।